WBCS MAINS 2022

BENGALI

DESCRIPTIVE

LIVE 07:00PM | 29 AUGUST 2022

BENGALI DESCRIPTIVE

❑ ডেঙ্গু মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।
(সূত্র : ডেঙ্গু কী, ডেঙ্গুর বাহক, জীবনচক্র, ডেঙ্গুর লক্ষণ, চিকিৎসা, মোকাবিলা পদ্ধতি, জনগণের ভূমিকা)

ডেঙ্গুর দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু একটি বড়ো জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ডেঙ্গু ভাইরাস ঘটিত রোগ-স্ত্রী এডিস ইজিপ্টি মশা দ্বারা বাহিত হয়। এই রোগ যে-কোনো বয়সের স্ত্রী-পুরুষের হতে পারে। ডেঙ্গুর চারটি ভাইরাস রয়েছে—ডেন ওয়ান, ডেন টু, ডেন থ্রি এবং ডেন ফোর। তার মধ্যে ডেন টু ও ডেন ফোর বেশি মারাত্মক। এই দুই ধরনের ভাইরাসে হেমারেজিক ফিভার হয়। ডেঙ্গুর যে-কোনো একটি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সেই ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এডিস মশা প্রধানত দিনের বেলায় কামড়ায়। যদিও রোদ ওঠার দু-ঘণ্টা পর্যন্ত ও বিকালে কামড়ানোর প্রবণতা বেশি থাকে। সংক্রামিত এডিস মশার কামড়ের তিন থেকে চৌদ্দ দিনের মাথায় মানবদেহে এই রোগ দেখা যায়। যে-কোনো পাত্রের পরিষ্কার স্বচ্ছ সামান্য জমা জলে এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো বিনা জলে একবছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ডেঙ্গুর লক্ষণগুলি হল—(ক) হঠাৎ মাঝারি থেকে উচ্চমাত্রায় জ্বর, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, (খ) মাংস পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, (গ) প্রচণ্ড দুর্বলতা, বমিভাব, ক্ষুধামান্দ্য, (ঘ) নাক ও মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, (ঙ) আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হতে পারে। বলাবাহুল্য, ডেঙ্গু রোগের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকারক ওষুধ নেই। ডেঙ্গু রোগীর জ্বর ও যন্ত্রণা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ওষুধ খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চিকিৎসক সুব্রত ভট্টাচার্য এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "ঠিক সময়ে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে ডেঙ্গু রোগ মারাত্মক হতে পারে।'

ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে—(ক) মশারি, মশার তেল, মশার ধূপ ব্যবহার করা (খ) মশার লার্ভা ধ্বংস করা, (গ) বাড়ির আশেপাশে জমা জল পরিষ্কার করা, (ঘ) এই রোগের উপসর্গ থাকলে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গণমাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে পরিবেশ উন্নত করতে পারলে এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

❒ **আপনার স্থানীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবির আয়োজন করা হয়েছে—এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।** *[Cultural Officer Exam-2019]*

চক্ষু-অপারেশন শিবিরে মানুষের উৎসাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারহাটি, ১০ মার্চ : রবিবার সকাল ১০টা থেকে কামারহাটি যুবক সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু-অপারেশন শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজকের শিবিরে ৫০ জন মানুষের সফলভাবে চক্ষু-অপারেশন সম্পন্ন হয়। আই স্পেশালিস্ট ১০ জন ডাক্তারের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন। রোগীরা মুগ্ধ হয়ে যান ডাক্তারবাবুদের সেবাপরায়ণ মনোভাবে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কবি তরুণ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিগত পাঁচ বছর ধরে যুবক সংঘ ক্লাব এই চক্ষু-অপারেশন শিবিরের আয়োজন করে আসছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এই ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আজ সকাল ১০টা থেকে চক্ষু-অপারেশন শুরু হয়। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অপারেশনের কাজ চলে। ক্লাবের সেক্রেটারি দাবি করেন, পাঁচবছর ধরে প্রায় ২০০ জন দরিদ্র মানুষের চক্ষু-অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও ডাঃ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি বিগত পাঁচ বছর ধরে এই শিবিরে আসছি। বছরে একটা দিন এই মানুষগুলোর সঙ্গে থাকতে পেরে গর্ব অনুভব করি।" স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেছেন। গত বছর রোগীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এই বছর ৫০ জন এসেছেন। আগামী বছর সংখ্যাটা ৬০ ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি করেন আয়োজকরা। একজন রোগী ষাট বছরের চন্দন সেন এই বিষয়ে মন্তব্য করেন, "বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের এই সুযোগ আমাদের মতো গরিব মানুষের কাছে বিধাতার আশীর্বাদের মতো।"

ক্লাবের সদস্যরা দূরের রোগীদের ক্লাবের পক্ষ থেকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় বিত্তশালী মানুষজন ও ব্যাবসাদাররা সেবামূলক কাজের জন্য যুবক সংঘ ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করেন। এলাকাবাসী ক্লাবের সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য গর্ব অনুভব করেন। যুবকসংঘ ক্লাব অন্যান্য ক্লাবগুলিকে সেবামূলক কাজে উৎসাহিত করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, যুবকসংঘ ক্লাব একদিন মানবসেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

❒ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "বিশ্ব উষ্ণায়ন : সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায়"

বিশ্ব উষ্ণায়ন : প্রতিকারের পথ!

আধুনিক কবি প্রশান্ত নেমোর ভাষায়, "ভোরের হাওয়া পাথর ছোঁড়ে দূষণ নামে জঙ্গলে / পৃথিবী আজ ধ্বংসের পথে মানুষ যাচ্ছে মঙ্গলে।" ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নে পৃথিবীর মানবসভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন নাম দিয়েছেন। নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী অ্যার হেনিয়াস প্রথম জানিয়েছিলেন, গ্রিন হাউস এফেক্ট সবুজ পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর কার্বন-ডাই অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রায় বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আধুনিক সভ্যতার অপরিমিত ভোগলিপ্সা, ক্রমবর্ধমান জনবিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, নগরসভ্যতা গঠন ও বিশ্বায়ন পৃথিবীর উষ্ণীকরণের সমস্যা বাড়াচ্ছে। কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৯২ সালে গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ' হুঁশিয়ারি দিয়েছে, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কম না হলে ২০৪০ সালে বর্তমান তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি বাড়বে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাস্তুতন্ত্র ও জীব জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও দাবানলের প্রকট বাড়বে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ক্ষতিকারক ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলি গ্রিন হাউস গ্যাসের সমস্যার সমাধানে ২০০৭ সালে তাইল্যান্ডের ব্যাংককে বৈঠক করেন। ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ডে জলবায়ু সম্মেলন হয়। গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ এখনই কমাতে না পারলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

❒ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "ভারতে নারী নির্যাতন ও নারী সুরক্ষা আইন"

ভারতীয় নারী : অসুরক্ষিত

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত ভারতীয় সমাজে নারী নির্যাতনের কলঙ্কিত ইতিহাস স্মরণ করে বলেছেন, "ইতিহাসে কোণঠাসা নারী আমরা / শুরু করলাম কথা মানবীর ভাষ্য।" সম্প্রতি উন্নত বিশ্বে নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির জয়ধ্বনি হচ্ছে। আর ভারতীয় সমাজে নারীরা নারী নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় সমাজজীবনে পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বধূহত্যা, পারিবারিক হিংসা, কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, যৌন হয়রানি, অপহরণ, অ্যাসিড হামলা ও যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় সমাজে নারীদের সুরক্ষিত রাখতে একগুচ্ছ আইন বলবৎ হয়েছে। ১৯৬১ সালে পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৫ সালে পারিবারিক হিংসা আইন, ২০০৬ সালে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ সালে কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হেনস্থা আইন চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এবং নারী ও শিশুবিকাশ দপ্তর এই আইন রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নারীদের যে-কোনো হেনস্থার নালিশ জানাতে 'সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক্স বক্স' নামে এক জানালা ব্যবস্থা চালু করেছে। মহিলাদের নিরাপত্তায় গৃহীত প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণে সরকার 'নির্ভয়া' তহবিল গঠন করেছে। পারিবারিক ও কর্মস্থলে নিগৃহীতা মহিলারা সুবিচার চাইতে রাজ্যের মহিলা কমিশনগুলির দ্বারস্থ হতে পারেন। মহিলাদের 'ইউনিভার্সালাইজেশন অব উইমেন হেল্পলাইন' প্রকল্পে আপৎকালীন পরিষেবা দেওয়ার সংস্থান করা হচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩০৪ নম্বর ধারায় বধূহত্যা কঠোর দণ্ডের মধ্যে পড়ে। ৩৫৪ নম্বর ধারায় যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে ২ বছর কারাবাস ও জরিমানার ব্যবস্থা আছে। আইপিসির ৩৬১-৩৭২ নম্বর ধারা অনুসারে অপহরণকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। বর্তমানে ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, দুঃসাহসিক অভিযানে নারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই ভারতীয় মহিলারা সম্মান নিয়ে বাঁচলে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার অধিকারের শর্ত পূরণ হবে।

❒ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : ভারতে শিশু নির্যাতন বাড়ছে

শিশু নির্যাতন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা / ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।" সমাজের এই শিশুরাই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের নাগরিক। অথচ ভারতের প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে দুজন শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সহায়তায় এক সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষায় জানা যায়, ভারতে ৫৩.২২ শতাংশ শিশু যৌন নিগ্রহের শিকার। আবার নিগ্রহকারীদের ৫০ শতাংশ শিশুর পরিচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনিসেফের সমীক্ষায় জানা যায়— প্রথমত, ভারতে তিন থেকে বারো বছরের শিশুরা বেশি সংখ্যায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সমীক্ষার অন্তর্গত শিশুদের ৬৯ শতাংশ শারীরিক নির্যাতন ভোগ করে। এর মধ্যে ৫৮.৬৮ শতাংশ বালক। তৃতীয়ত, শিশুরা পারিবারিক জীবনে প্রধানত বাবা-মায়ের দ্বারা নির্যাতিত হয়। চতুর্থত, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে দুজন শারীরিক শাস্তি পায়। মনোবিদ্‌দের মতে, অপরাধী, মানসিক রোগীদের অতীত ইতিহাসে দেখা যায়—এদের অনেকেরই শৈশবজীবন পরস্পর বিরোধী বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে কেটেছে। বাবা-মায়ের একটা বড়ো অংশ শিশুর উপর কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসেন। শাসনের নামে শিশুপীড়নে শিশুরা বিতৃষ্ণায় পরনির্ভরশীল ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা ও দুঃস্বপ্নে শরীর-মনের যথাযথ বিকাশ ঘটে না। পরবর্তী সময়ে মাদকাসক্ত হয়ে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ২০১২ সালে একটি সংবাদপত্রের সমীক্ষায় জানা যায়—ভারতের অভিভাবকদের ৬৫ শতাংশ সন্তানদের শাসন করার জন্য মারধর করতে বাধ্য হন।

শারীরিক নির্যাতনে বিপর্যস্ত শিশুরা পরিবারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে বাইরের পরিবেশে মূল্যায়নের জায়গা খুঁজে নেয়। শিশুদের শৈশব সুরক্ষিত করতে সুপ্রিম কোর্ট ২০০০ সালে বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে। ২০১২ সালে 'প্রোটেকশন অব দ্য চিলড্রেন ফ্রম সেক্সচুয়াল অফেন্স' বিল পাশ হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে।

❒ **নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "মানুষের মানবাধিকার থাকা জরুরি অথবা ভারতে মানবাধিকারের গুরুত্ব**

ভারত ও মানবাধিকার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মহেশ' গল্পের শেষে বলেছেন, "যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।" রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাপী মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও শোষণহীন জীবনযাপনের অধিকার সম্বন্ধে কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে সেগুলিকে মানবাধিকার বলে। ১৯৪৮ সালের, ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন খসড়াটি গৃহীত হয়। সনদের মূল বিষয়—জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও মূল্য সমানভাবে প্রযুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সে 'দি প্রোটেক্শন অব হিউম্যান রাইট্স অ্যাক্ট' প্রথম চালু হয়। ১৯৯৪ সালের, ৮ জানুয়ারি আইনটি লোকসভায় অনুমোদিত হয়। এই আইনে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে মানবাধিকার কমিশন গঠন, নারী স্বাধীনতা, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাসবাদসহ যে-কোনো ব্যাপারে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তার ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এই কমিশনের চেয়ারপার্সন হবেন। বলাবাহুল্য, সমাজে মানুষকে দমন করলে, নারীজাতি অত্যাচারিত হলে, বিচারের পক্ষপাতিত্বে, শিশুশ্রমিক দিয়ে কাজ করালে, কুসংস্কার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি—মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষিত ও মানুষকে সচেতন করা, মানবাধিকার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা।

দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে মানবাধিকারের গুরুত্ব আছে। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কবির দাবি সফল হোক—"মানবাধিকারের বৃন্ত থেকে অধিকারের ফুল তুলে / আমাদের জীবনের ফুলদানি সাজিয়ে নেব।"

❒ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'দেহদান : একটি মানবিক কর্তব্য'

দেহদান : মানবিক দান

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসময় বলেছেন, "আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্যকোন মূল্য নাই।" আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ পরোক্ষভাবে দেহদানের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারেন। ভারতবর্ষে মৃতদেহকে দাহ করা বা সমাধিস্থ করায় শাস্ত্রীয় রীতি আছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় কৃত্রিম উপায়ে অন্য মানুষের দেহে সংস্থাপন করা যায়। একজন মুমূর্ষু মানুষ জীবনের আশ্বাস ও নতুন আলোর সন্ধান পেতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে ১৯৯৪ সালে মানব অঙ্গদান আইন পাশ হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে অঙ্গদানের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি। ভারতে দেহদানের দু'রকম প্রক্রিয়া আছে—প্রথমত, কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অন্য কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে অঙ্গদান করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তি তাঁর দেহদানের আগাম উইল করে যেতে পারেন অথবা পরিবারের মানুষজন মৃত ব্যক্তির দেহদান করতে পারেন। মানুষের সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রেও আধঘণ্টার মধ্যে চোখ, কিডনি, লিভার কাজে লাগানো যায়। ভারতে আইনি বাধা ও প্রশাসনিক জটিলতায় অঙ্গদান সফলতা পায় না। সম্প্রতি ভারতে ব্রেনডেথের পর দেহদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষায় জানা যায়, ভারতে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ অঙ্গের বিকলতায় মারা যায়। মানুষ দেহদান করলে এইসব মানুষেরা উপকৃত হবেন। পৃথিবীর অনেক দেশ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য মৃতদেহকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি ঘোষণা করে।

ভারতে ১৯৪৮ সালে অ্যানাটমি অ্যাক্ট পাশ হয়। ভারতের মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা দেহদানে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। ভারতীয় সমাজের বৃহৎ অংশ দেহদানকে অমানবিক ও ধর্মবিরুদ্ধ মনে করে। গণমাধ্যমে প্রচার করে মানুষকে দেহদানে আগ্রহী করতে হবে। ভারতে মানুষের সচেতনতা ও উপযুক্ত সরকারি পরিকাঠামো মানুষের মহৎ দেহদানকে একদিন সার্থক করবে।

❑ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও যুবসমাজ" *[WBCS Exam-2019]*

সোশ্যাল মিডিয়া

বিশ্বায়নের পরবর্তী পৃথিবীতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের নবতম সংযোজন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখানে বহু মানুষ তথ্য আদান-প্রদান করে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। সারাবিশ্বের অজানা বিষয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। যেসব আত্মীয় বিদেশে থাকেন তাঁরা সরাসরি খবর আদান-প্রদান করতে পারেন। বলাবাহুল্য, মানুষের রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গানশোনা, খেলাধুলা, বন্ধুত্ব, বিবাহ সবই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার এমন মাধ্যম যুবসমাজের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আজকের যুবসমাজকে অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংকে 'সব পেয়েছির দেশ' হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য এই মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। দেশের যুবসমাজ খুব সহজেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। সমাজবিরোধীরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। কখনও ব্যাংকের গ্রাহকদের গোপন কোড জেনে টাকা আত্মসাৎ করছে। যুবসমাজ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষ ঠকানো, কাউকে কলঙ্কিত করতে মিথ্যা প্রচার হিসাবে এই মাধ্যম ব্যবহার করছে। কখনো বন্ধুত্ব করে তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য থেকে অশ্লীল ছবি পর্যন্ত ব্যবহার করছে। দেশের যুবসমাজ এই সাইট ব্যবহার করে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠছে। সাময়িক তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মানবিকবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। সরকারকে সাইবার ক্রাইম রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর সুফলকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

Thank you